অনন্য রায়হান

বাক্স ১: এক নজরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর সম্পূর্ণ নাম: তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।
- এটি ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত ২০তম আইন।
- বিশ পৃষ্ঠার এই আইনে মোট ৮টি অধ্যায় রয়েছে।
- আইনের মাধ্যমে তথ্য লেনদেনে তিনটি পক্ষ চিহ্নিত হয়েছে: প্রথম পক্ষ বা তথ্য চাহিদাকারী, দ্বিতীয় পক্ষ বা তথ্য প্রদানকারী, তৃতীয় পক্ষ বা তথ্য ধারণকারী, যার কাছ থেকে দ্বিতীয় পক্ষ তথ্য সংগ্রহ করে প্রথমপক্ষকে দেয়।
- আইনে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যেকোন তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- এই আইন দ্বারা সরকারের ৮টি প্রতিষ্ঠানের গোয়েন্দা ইউনিটকে (সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে নয়) তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।
- এই আইনে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে । তবে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে দ্বিতীয় পক্ষের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যাবে।
- ২০টি পরিস্থিতিতে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া নোটশীটকে তথ্যের সংজ্ঞার বাইরে রাখায় অনেক সিদ্ধান্ত জানা যাবে না।
- এই আইনের অধীনে ৯০ দিনের মধ্যে তিন সদস্য বিশিষ্ট তথ্য কমিশন গঠন করার কথা বলা হয়েছে।
- তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতির বা সমস্যা সৃষ্টির জন্য শাস্তি হিসেবে জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া ক্ষতিপূরণ ও বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- এই আইনে তথ্য প্রদানের ব্যাপারে তথ্য কমিশনের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সুযোগ রাখা হয়নি। তবে সংবিধানের ১০২ ধারা অনুসারে যেকোন সংক্ষুব্ধ নাগরিক উচ্চ আদালতে রীট আবেদন করতে পারবে।
- এই আইনের ৮, ২৪ ও ২৫ ধারা ১ জুলাই, ২০০৯ থেকে কার্যকর হবে। এগুলি ছাড়া অন্যান্য ধারাগুলি ২০ অক্টোবর ২০০৮ হতে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য প্রদানকারী ইউনিটসমূহ (সেকশন ২)

তথ্য অর্থ (সেকশন ২)

তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি (সেকশন ১১)

তথ্য লাভের অধিকার (সেকশন ৪)

কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় (সেকশন ৭)

আংশিক প্রকাশিতব্য তথ্য (ধারা ৩২)

১। জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)।
২। ডাইরেক্টরেট জেনারেল ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই)।
৩। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ।
৪। ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), বাংলাদেশ পুলিশ।
৫। স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)।
৬। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল।
৭। স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।
৮। র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব)-এর গোয়েন্দা সেল।

উলেণ্যখ্য যে, আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোনো তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সহিত জড়িত থাকিলে উক্ত ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী: তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রাপ্তি (সেকশন ৫ এবং ৮)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সেকশন ১০)

দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্বসমূহ (সেকশন ৯)

দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা সংক্রান্ড়:
তথ্য কমিশনের কার্যাবলী (সেকশন ২৫ ও ২৬)

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের নিয়মাবলী (সেকশন ৮)

প্রকাশ, প্রচার, প্রাপ্তি ইত্যাদি:
তথ্য কমিশনের কার্যাবলী (সেকশন ১৩)

আইনের প্রাধান্য (সেকশন ৩)

আপীল, অভিযোগ, ইত্যাদি (সেকশন ২, ২৪)

তথ্য কমিশন : অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি, ইত্যাদি (সেকশন ২৫, ২৬)

জরিমানা ইত্যাদি (সেকশন ২৭)

আপিল/অভিযোগ: তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (সেকশন ১৩)

পঞ্চম অধ্যায়

তথ্য কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

ষষ্ঠ অধ্যায়

তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

অষ্টম অধ্যায় : বিবিধ

কেসস্টাডি ৪: জনপ্রতিধি নির্বাচনে তথ্যের ভূমিকা

ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের মতে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার ভোটারদের বাক স্বাধীনতার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আদালত ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম এসোসিয়েসন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (২০০২(৫) SCC) মামলায় ২০০২ সালে প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক রায়ে বলেন ঃ "নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার মানেই ভোটারদের স্বাধীনভাবে প্রার্থী নির্বাচনের অধিকার। এক্ষেত্রে ভোটাররা মত প্রকাশ করে ভোট প্রদানের মাধ্যমে। একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তার প্রার্থী সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য জানার অধিকার রাখে, যে প্রার্থী সংসদে তার প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং তার সম্পদ ও স্বাধীনতা সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন করবেন। যাতে করে সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি একজন আইন ভঙ্গকারীকে আইন প্রণেতা হিসেবে নির্বাচন করবেন কিনা তা পূর্বাহ্নেই বিবেচনায় আনতে পারেন।" (তথ্য অধিকার আন্দোলন, ২০০৭, জানুয়ারি, পৃ: ২৯)

সৌভাগ্যবশত আমাদের আদালতও নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছেন। ২০০৫ সালের ২৪মে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত ও বিভিন্ন তথ্যাবলী সংগ্রহ সম্পর্কে একটি যুগান্তকারী রায় প্রদান করেন (আব্দুল মতিন চৌধুরী এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ) রায়ে নির্বাচন কমিশনকে প্রত্যেক প্রার্থী থেকে মনোনয়নপত্রের সাথে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী এফিডেভিট আকারে সংগ্রহ করার এবং এগুলো গণমাধ্যমকে দিয়ে জনগণের মাঝে প্রচার করার নির্দেশ প্রদান করা হয় ঃ (ক. সার্টিফিকেটসহ প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, (খ) বর্তমানে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী অপরাধের অভিযোগের তালিকা (যদি থাকে), (গ) অতীত ফৌজদারী মামলার তালিকা ও ফলাফল, (ঘ) প্রার্থীর পেশা, (ঙ) প্রার্থীর আয়ের উৎস এবং উৎসমূহ, (চ) অতীতে সংসদ সদস্য হলে জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকার বর্ণনা, (ছ) প্রার্থী ও প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের সম্পদ এবং দায়-দেনার বর্ণনা এবং (জ) ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে এবং কোম্পানি কর্তৃক যে কোম্পানিতে প্রার্থী চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক কিংবা পরিচালক– গৃহীত ঋণের পরিমাণ ও বর্ণনা।

২০০৮ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন নিজে প্রার্থীদের তথ্য প্রচার করেছে। সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ও পোষ্টার ছাপিয়ে প্রার্থীদের হলফনামার তথ্য প্রচার করেছে, যা প্রার্থী নির্বাচনে ভূমিকা রেখেছে। জনগণ প্রার্থী বাছাইয়ে এই তথ্য ব্যবহার করেছে।

ধন্যবাদ